দৈনিক সংবাদ ১৩৪
তারিখ 09 JUL 1991
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬
৬০

১৪

প্রসঙ্গঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্ট

সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসাইন

"I survived !" এক খ্যাতনামী রাশিয়ান কাউন্টেসকে প্রশ্ন করা হয়েছিল উনিশ শ' সতের'র বলশেভিক বিপ্লবের সময় তিনি কি করেছিলেন। তার উত্তর— বিপ্লব সত্ত্বেও তিনি বেঁচেছিলেন। ফ্রান্সের বোরবন নৃপতি ষোড়শ লুই-এর মন্ত্রী ত্যালের'কে একই প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনিও একই উত্তরই দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে বহু ভাগ্যবিপর্যয়, বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে মানবসভ্যতার ইতি-হাসে বিশ্ববিদ্যালয় বেঁচে আছে, অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখেছে বিগত প্রায় আটশত বছরের অধিককাল যাবৎ। বার বার আঘাত হেনেছে রাষ্ট্রনায়করা, গীর্জার প্রভুরা স্বাধীন চিন্তা এবং মুক্তবুদ্ধি চর্চার এই কেন্দ্রকে ধ্বংস করার জন্য, আয়ত্তে আনার জন্য। রাজ্যের উত্থান-পতন হয়েছে, বিপ্লব-প্রতিবিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে সমাজের দেহ, আবার গড়ে উঠেছে নতুন অবয়ব নিয়ে, সংগ্রামের পর শান্তি এসেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব আক্রান্ত হয়েছে, দুর্বল হয়েছে, কিন্তু ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয়নি কখনো, অস্তিত্ব লোপ পায়নি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় যুগে যুগে এক মৌলিক ও মানবিক চাহিদা পূরণ করে এসেছে, সর্ববিধ বাধা-বিপত্তি ও বিপর্যয়ে অবিচল থেকে। জ্ঞান আহরণ, সংরক্ষণ, উৎকর্ষসাধন এবং যুগ থেকে যুগে জ্ঞান সঞ্চারণ— এই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকালের অনুধ্যান। "However deviant it was at times and however numerous heresies committed in history, the university always returned to this function, এবং এই কারণেই বিশ্ববিদ্যালয় শুধু তার অস্তিত্বই অক্ষুণ্ন রাখেনি, সমৃদ্ধিও লাভ করেছে।

কিন্তু আজ এক নিদারুণ বিপর্যয়ের কবলে বাংলাদেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহ, রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে নানাভাবে ক্ষতি-গ্রস্ত, নানা আঘাতে আহত হওয়া সত্ত্বেও যেটুকু অস্তিত্ব ও মর্যাদা নিয়ে তারা চলছিল তা-ও বুঝি আজ বিপন্ন। দেশের মানুষের বিরূপ সমালোচনা এবং প্রশ্নের সম্মুখীন, নন্দিত হবার পরিবর্তে নিন্দিত। কিন্তু কেন? উত্তর ঃ যেখানে পরমতসহিষ্ণুতা, সহ-অবস্থান সমৃদ্ধ জ্ঞানানুশীলন উপযোগী পরিবেশ বিরাজমান থাকার কথা সেখানে সশস্ত্র সংঘর্ষ, বন্দুক যুদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজের বৃহদংশের কাছে এ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। সন্ত্রাসের কারণে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবচেয়ে বেশি। চার বছরের শিক্ষা-জীবন সাত বছরেও শেষ হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ বন্দুক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, মতবিরোধের মীমাংসা করতে চায় অস্ত্রের ভাষায় এবং তারা এহেন কার্যকলাপে রত হয় যেসব প্রভাব, ধ্যান-ধারণা বা মানসিকতার বশবর্তী হয়ে তা বাইরের বিক্ষুব্ধ এবং মূল্যবোধ অবক্ষয়পীড়িত বৃহত্তর সমাজ সৃষ্ট। তা নিষ্ক্রিয় করে দেয়া, প্রতিরোধ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, উপাচার্য বা প্রশাসনের পক্ষে বর্তমান সামাজিক অবক্ষয় ও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে খুব সহজ নয়। বিষয়টি বিচার-বিশ্লেষণের দাবি রাখে। অথচ এই সন্ত্রাসের দায়-দায়িত্ব বহন করতে হয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসমাজকে, উপাচার্য এবং প্রশাসনকে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি এবং শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস রোধের দায়িত্ব থেকে তারা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত নন। কিন্তু এককভাবে সাফল্যের সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু গত ডিসেম্বরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষক এবং প্রশাসনকে দায়ী করা হয়েছে এ ব্যাপারে গঠিত কমিশন রিপোর্টে। এমনকি, বিশ্ববিদ্যালয় আইন '৭৩-এর সমালোচনা করা হয়েছে এবং সংশোধনের সুপারিশ করা হয়েছে। এ দেশের কমিশন গঠিত হয় কিন্তু সাধারণত কোন কাজ হয় না, কমিশনের রিপোর্ট অনেক সময়েই আলোর মুখ দেখতে পায় না। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা তাই। কিন্তু আলোচিত কমিশন এ ক্ষেত্রে একটি প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম। তিনশত পাঁচ পৃষ্ঠার রিপোর্টটি ইংরেজীতে। বাংলাদেশ সরকারের কাজকর্ম বাংলা ভাষায় হবে এ বিধান বহুকাল পূর্বেই দেয়া হয়েছে। কিন্তু কি কারণে এ বিধান লংঘিত হলো তা আমাদের বোধগম্য নয়। শিক্ষকদের মধ্যে মতবিরোধ, দলাদলি এবং তাদের অভাব-অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ছাত্রদের সমর্থন লাভের চেষ্টা, তাদের জড়িত করা, ব্যবহার করা, যেকোন বিচারে নিন্দনীয় এবং এ ব্যাপারে কমিশনের সঙ্গে আমরা একমত। কিন্তু মতাদর্শগত বিভিন্নতার ভিত্তিতে শিক্ষকদের মধ্যে বিভক্তি তাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বা কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ সমর্থন, উপাচার্য বা প্রশাসনের দায়-দায়িত্ব, '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন সম্পর্কিত যে ধরনের আলোচনা ও বিশ্লেষণ রিপোর্টে সন্নিবেশিত হয়েছে তার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে ঐকমত্য পোষণ আমরা করতে পারছি না। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, রিপোর্টটি মূলত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত হলেও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও তা বিরাজমান পরিস্থিতি-গতভাবে প্রাসঙ্গিক। কারণ প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ই সন্ত্রাসকবলিত, শিক্ষকরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত এবং সন্ত্রাস দমনে উপাচার্য বা প্রশাসন অসহায় এবং অসফল। তাছাড়া তিয়াত্তুরে দেশের চারটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একই ধরনের সাংবিধানিক কাঠামো ও বিধিবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল।

নিরোধ এবং নিরাময়— মানবদেহ ব্যাধিমুক্ত করার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রে এ দু'ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। ব্যাধি যেন বিস্তারলাভ করতে না পারে এবং বার বার আক্রমণ করতে না পারে তার জন্য নিরোধমূলক ব্যবস্থা। নিরাময় হলো মূল ব্যাধির চিকিৎসা এবং একই সঙ্গে ব্যাধিজনিত উপসর্গসমূহের উপশমের ব্যবস্থা নেয়া। কিন্তু যদি শুধু উপসর্গ উপশমের ব্যবস্থা নেয়া হয় মূল ব্যাধির চিকিৎসা না করে, তবে ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর মৃত্যু অবধারিত। বাস্তবক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে সন্ত্রাসী তৎপরতায় যারা লিপ্ত হয় তাদের চিহ্নিত করা, তাদের ধ্যানধারণা ও মানসিকতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া, কাদের প্ররোচনায়, কোন্ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তারা এহেন কাজে প্রবৃত্ত হয়, তাদের অস্ত্রের উৎস কোথায়— এসব সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে তদনুযায়ী মূল রোগের চিকিৎসা করা একান্তভাবে প্রয়োজন। কারা বা কোন্ পরিস্থিতি সন্ত্রাসে ইন্ধন যোগায়, শিক্ষকদের মধ্যে বিভেদ কিভাবে কিংবা প্রশাসনের কোন্ দুর্বলতা সন্ত্রাসীদের উৎসাহিত করে তা মুখ্য বা মূল আলোচনার বিষয় নয়। মূল ব্যাধি উৎসাদনের লক্ষ্যে এ সম্পর্কে আলোচনা, বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ডিসেম্বরের ঘটনায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র আহত হয়েছেন, একজন ছাত্রনেতা নিহত হয়েছেন। এই হত্যা ও হামলার দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ ছিল কমিশনের অন্যতম কাজ। কিন্তু আইনগত কারণে কমিশন তা করা থেকে বিরত রয়েছেন। অস্ত্রধারী এবং আঘাতকারীদের অভিযুক্ত করে উপজেলা কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশী তদন্ত চলছে। সুতরাং এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে কোন বক্তব্য রাখা আইনানুগ হবে না কমিশনের এই যুক্তি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য। এ প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় উল্লেখ্য।

একঃ সুষ্ঠু তদন্তের লক্ষ্যে ঘটনার পূর্বাপর বিশ্লেষণ ও বিবেচনার প্রয়োজন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত পাঁচ বছর যাবৎ সন্ত্রাসের তাণ্ডবলীলা চলেছে; গত ডিসেম্বরের ঘটনা তারই চরম পরিণতি এবং তারপরেও প্রায় ৩/৪ সপ্তাহ সন্ত্রাসীরা এই বিশ্ব-বিদ্যালয়কে অবরোধ করে রেখেছিল, শিক্ষক-শিক্ষিকারা লাঞ্ছিত হয়েছেন, সিন্ডিকেটের কোন সভা হতে পারেনি, প্রশাসন ছিল বিকল। রিপোর্টে পূর্বের ও পরের ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ বা বিশ্লেষণ স্থান পায়নি।

দুইঃ অন্যদিকে শিক্ষকদের ভূমিকা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে দলাদলিকে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘটনার জন্য দায়ী করা হয়েছে। আমাদের আশঙ্কা— এতে কি সন্ত্রাসীরা উৎসাহ বা প্রশ্রয় পাবে না?

তিনঃ শিক্ষকদের মধ্যে দল গঠনকে নিন্দা করা হয়েছে। অবশ্যই নিন্দনীয় যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী হয় এবং দল গঠনে বা দলীয় স্বার্থ উদ্ধারে যদি ছাত্রদের জড়িত করা হয়। কিন্তু যেখানে সিন্ডিকেট, সিনেট, একাডেমিক কাউন্সিল ও বিভিন্ন কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি রয়েছে এবং ডীন নির্বাচন রয়েছে সেখানে দল গঠন অস্বাভাবিক নয়, অনভিপ্রেতও নয়। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে দল থাকবেই। পৃথিবীর প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষকদের দল রয়েছে তা কোন ক্ষেত্রে মতাদর্শগত, কোন ক্ষেত্রে নির্বাচনের প্রয়োজনে। C.P SNOW রচিত 'The Master' গ্রন্থে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডীন নির্বাচন নিয়ে অনেক কৌতুকপ্রদ ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। ভিন্নমত থাকলে দল থাকবে। ভিন্নমত পোষণের বা প্রকাশের সুযোগ সংকোচন হলো কূপমণ্ডুকতা উৎসাহিত হবে যা মুক্তিবুদ্ধি চর্চার কেন্দ্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। শিক্ষকরা দল গঠন করেন কিন্তু তারা তো সন্ত্রাসীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেন না। অস্ত্রের উৎস কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিতে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে— একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু সে ভূমিকাও সীমাবদ্ধ। সমাজের পরি-বারের সব সম্পর্কের মতোই ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক আজ যান্ত্রিক। পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত ছাত্র-শিক্ষকের যে পিতা-পুত্রসুলভ সম্পর্ক ছিল তা এখন প্রায় অবলুপ্ত এবং অচল। আশি এবং নব্বই দশকে পৃথিবীর সব বিশ্ববিদ্যালয়েই এখন প্রশ্ন উঠেছে— Is the relationship one of customer, who having certain needs locates places where services to meet these needs can be purchased? আমাদের দেশে ততটুকু না হলেও ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটেছে। যার ফলে শিক্ষকের প্রভাব ছাত্রের ওপরে আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় না। শিক্ষকদের রাজ-নীতিতে অংশগ্রহণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দেশের অন্য নাগরিকদের মতোই শিক্ষকদের জীবনও সংঘাতময়, সংকটময়। তারা তপোবনের ঋষিসুলভ বিচ্ছিন্নতা বা নির্বিকারত্ব নিয়ে আর থাকতে পারছেন না। বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবস্থাও তাই। 'Faculty members were both initiators and positive reactors to many campus disruption. Professor became increasingly involved in politics, some as party activists, some as intellectual commentators on political events.' রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য হিসেবে কিংবা দলের নীতিনির্ধারক বা সমালোচকের ভূমিকায় অধ্যাপকদের আজ দেখা পাওয়া যায়।

রিপোর্টে উপাচার্য এবং প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে এবং ঘটনার জন্য অনেকাংশে দায়ী করা হয়েছে। বলা হয়েছে, উপাচার্য সমস্যা সমাধানে নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন ছিলেন এবং পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বাইরের প্রভাবের আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু আরও গভীর বিশ্লেষণে বাস্তব অবস্থাটি উদঘাটিত হতো। শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নয়, দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরাই বন্দুকধারীদের তৎপরতার সম্মুখে কতখানি অসহায়— তা উপলব্ধি করা যেতো। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলে উপাচার্যকে সর্বদা তাদের হামলার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতে হয়, সিন্ডিকেট সিনেটের সভা করা যায় না সন্ত্রাসীদের আক্রমণের আশঙ্কায়। সারাক্ষণ পুলিশ পাহারা রাখতে হয় উপাচার্যের বাসভবনের চারদিকে। এসব কথা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে। কমিশন এ সম্পর্কে অবিদিত থাকার কথা নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় আইন '৭৩ সংশোধনের সুপারিশ করা হয়েছে। তিয়াত্তুরের আদেশ শুধু একটা আইন নয়, এক ইতিহাস। বহু রক্ত ঝরেছে রাজপথে এই আইনের জন্য, বহু আত্মত্যাগের বিনিময়ে এই আইন। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে কালাকানুনের সেই কালো দিনগুলো এখনও আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি। তাই কোন সংশোধনের প্রস্তাব শুনলেই মন শঙ্কায় ভরে যায়। অবশ্য এই আইন কোন পবিত্র ধর্মগ্রন্থ নয় যে প্রয়োজনবোধে এর কোন ধারা পরিবর্তন করলে মহাপাপ হবে। সংশোধন অবশ্যই করা যেতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধের যে ফল্গুধারা রয়েছে এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা যেন কোন মতেই আহত না হয়।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস প্রতিরোধ কারও একক দায়িত্ব নয়, এ দায়িত্ব সরকারের, সমাজের, শিক্ষকের, ছাত্রের, অভিভাবকের, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দলের— সম্মিলিতভাবে সকলের। আমরা আনন্দিত প্রধানমন্ত্রী ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার উদ্যোগ নিয়েছেন। গত পরশু এই উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তারা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন। আমরা এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু সিদ্ধান্ত বা ঐকমত্যই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন উপযুক্ত বাস্তব পদক্ষেপের।